বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন

পারভেজ চৌধুরী

বিজ্ঞানের যে সব অগ্রগতি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে গণমাধ্যমের ইতিহাস অন্যতম আর গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশন হচ্ছে পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাবশালী । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আবিষ্কার হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিস্ময়জনক ভাবে প্রসারিত হতে থাকে টেলিভিশন । তখন থেকেই টেলিভিশনের নীতিমালা প্রণয়ণে রাজনৈতিক-সামাজিক দায়িত্ববোধের বিষয়টি প্রাধাণ্য পায় ।   বলা যায় টেলিভিশন মাধ্যমটি মানবিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার । মানুষের শিক্ষা বা মনে দাগ কাটার ক্ষেত্রে দৃশ্যের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী।

গণমাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন অত্যন্ত শক্তিশালী কারন এটি দৃশ্য মাধ্যম । পত্রিকার জন্যে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় কিন্তু টেলিভিশনের জন্যে তা প্রযোজ্য নয় । আমাদের এই অঞ্চল দড়িাণ পূর্ব এশিয়ায় টেলিভিশন শুরুর ইতিহাস একেবারে নতুন নয়। টেলিভিশন আবিষ্কার অর্থাৎ তিরিশ দশক থেকে আমাদের এই অঞ্চলে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরুর সময়ের পার্থক্যও ৩০-৩৫ বছর হবে অর্থাৎ ষাট দশক। ভারতে ১৯৫৯ সালে দিল্লী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় টেলিভিশন ইউনেস্কোর অর্থায়নে গুটিয়ে ফেলা ফিলিপস কোম্পানীর রেখে যাওয়া কিছু পুরানো যন্ত্রপাতি দিয়ে। কিছুদিন চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধের প্রায় ১৩ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে আবার টেলিভিশন সম্প্রচার চালু হয়। ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরুর সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৬৪) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এর বিরোধী, তাঁর মতে টেলিভিশন হচ্ছে বিলাস সামগ্রী এটি কেবল মধ্যবিত্তের অধিকারেই থাকবে। দরীদ্র জনগোষ্ঠীর তেমন উপকারেই আসবেনা। তবে তিনি ভারতের সমাজ উন্নয়নে রেডিওকে অধিকতর উপযোগী ধরে নিয়েছিলেন এবং তা বিশ্বাসও করতেন । পরবর্তীকালে ভারতের আরেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীময়ী ইন্দিরা গান্ধী গণমাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় সমাজে টেলিভিশনের বিকাশে মনোযোগী হন । এ নিয়ে ভারতের প্রথম দিকের তিন প্রধানমন্ত্রী নিয়ে একটি কৌতুক রয়েছে “ নেহেরু ওয়াজ এ ভিশনারী, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ওয়াজ এ রি-ভিশনারী এন্ড ইন্দিরা গান্ধী ওয়াজ এ টেলিভিশনারী ।” পাকিস্তানে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে আর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। সর্বপ্রথম চালু হয় ভারত, দ্বিতীয় পাকিস্তানে এবং তৃতীয় হচ্ছে ঢাকায় টেলিভিশন চালু হয় । তবে ঢাকা টেলিভিশন এর চরিত্র কি দাড়াবে-তার জানান দিয়ে দিয়েছিল উদ্বোধনী অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই কুখ্যাত সামরিক শাসক আইয়ুব খান যখন ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলো ঠিক সে সময়ে পল্টনে চলছিল বিরোধী দলীয় নেত্রী ফাতেমা জিন্নার সমাবেশ এবং আইয়ুব খান এর বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ। সেদিনের সংবাদ পরিবেশনায় তার ছিটেফোটাও আসেনি। সে সময়ে ঢাকায় টেলিভিশন চালু করার রাজনৈতিক কারণ ছিলো প্রধান। অর্থাৎ সামনে ছিলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সে নির্বাচনে সামরিকজান্তা আইয়ুব খান ছিলো একজন প্রার্থী ।   তারপর থেকে একই ধারাবাহিকতায় চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ফলে শুরু থেকেই

(বাংলাদেশ) টেলিভিশন ছিল গণবিচ্ছিন্ন একটি সরকারি প্রচার যন্ত্র। কিন্তু সারা বিশ্বে গনমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী উপায় হিসাবে । ফলে ৬০ দশক থেকে শুরু হয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগের ভূমিকা কে গুরত্বপূর্ন করে দেখা । দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে সকল উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি অর্থনীতিকেই বিবেচনা করা হতো। সেখানে যোগাযোগকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমন্বয়ের অনুঘটক হিসাবে বিবেচনা করার প্রয়াসে সেই সময় থেকেই পৃথিবীতে চলছে স্যাটেলাইট নিয়ে অনেক গবেষণা, চিন্তাভাবনা। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘটতে থাকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলেই মিডিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে বলা যায় বিপ্লব। সেই মিডিয়া বিপ্লবের ঢেউ শুধু সারা পৃথিবীতেই নয় আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তুমুল পরিবর্তন ঘটাতে থাকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। সেই পরিবর্তনশীল সময়ে তিনটি বিষয় সারা বিশ্বে মিডিয়াকে প্রভাবিত করে। তা হলো ১. সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ২. বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজারের ক্রমবর্ধনশীলতা ৩. তথ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রযুক্তির দ্রুতহারে বিকাশ।

পরিবর্তিত বিশ্বে অর্থনৈতিক উদারীকরণের কারণে মিডিয়ার সকল শাখায় পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ফলে অল্পসময়ের মধ্যে মিডিয়ার সমন্বিত খাত ক্রমশই পুঁজিনির্ভর বাজারে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং এর প্রভাব সরাসরি পরে বিশ্ববাজারে। মুক্তবাজার অর্থনীতির চরিত্রগত ধারার দৌরাত্মে শুরু হয় মিডিয়ার বাণিজ্যকরণ। শুধুমাত্র বাণিজ্যকরণ বলা হয়তো ঠিক হবে না। সেটি ছিল অন্য জানালা খুলে দেয়া। বসার ঘরের টেলিভিশন সেট শুধু একঘেয়ে ইডিয়ট বক্স হয়ে রইলো না, হয়ে গেল আকাশ সংস্কৃতির এক বৈশ্বিক জানালা। যা কিনা বদলে দিতে থাকলো সমাজ, সংস্কৃতি আর চিন্তনক্রিয়ার প্রাত্যহিকতা।

পৃথিবীজুড়েই ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করা স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিকাশে বাংলাদেশের ভুমিকা খুবই অনুল্লেখ্য। তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শক্তিশালী ভাবে বেড়ে উঠে বাংলাদেশের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত। বাংলাদেশের পাশ্ববর্তী দেশ বলছি এ কারণেই বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশনের গতিধারা অনেকাংশে নির্ভর করছে ভারতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশনের গতিধারার উপর । বিষয়টা খুবই দুঃখজনক হলেও একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটি একটি সুবৃহৎ দেশের পাশ্ববর্তী ছোট দেশ হওয়ার অন্যতম কারণও হতে পারে।

ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল কেন এত শক্তিশালী হয়ে উঠলো, বানিজ্যিক ও সামাজিক প্রভাবক হিসাবে ? প্রথমত.পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরন নীতিমালা দ্বিতীয়ত. শক্তিশালী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তথাকথিত বলিউড । ভারতের স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইন্ড্রাস্ট্রি বিকাশের অন্যতম কারণ ধরা হয় বানিজ্য সফল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে। এই শক্তিশালী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর কারণে ভারতে হলিউড এর আগ্রাসন রুখতে পেরেছে বলে মনে করা হয় । বাংলাদেশের চিত্র তার সম্পূর্ন বিপরীত অর্থাৎ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী খুবই দূর্বল । তৃতীয়ত. বিশ্বায়নের কারণে ভোগবাদী মানসিকতার প্রসার ঘটে এবং বিস্তৃতি ঘটে ভোগ্যপণ্যের সুবৃহৎ বাজারের। বহুজাতিক ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের আকাশ সংস্কৃতির আকাশ তখন পর্যন্ত মুক্ত থাকলেও অরক্ষিত সীমান্তের চোরাইপথে প্রবেশ করে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ডিশ এন্টেনা। কারণ স্যাটেলাইট টেলিভিশন রিসিভ করার জন্য যে ডিশএন্টেনা প্রয়োজন তা কাস্টম বিভাগের যোগসাজসে ব্যক্তি পর্যায়ে অসাধু পথে অর্থাৎ চোরাই পথে আসতে শুরু করে বাংলাদেশে। এ থেকে অবশ্য বাংলাদেশের

শাসকবর্গের সমকালীন আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা দু'টিরই প্রমাণ মেলে । সে সময়ে ডিশ এন্টেনা ব্যবহৃত হতো শুধুমাত্র ধনীক শ্রেণীর বাসা-বাড়ীতে। তার কোন আইনগত বৈধতা ছিলো না। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেটওর্য়াক শুরু হয়। অবশ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনেও সম্প্রচারিত হতে শুরু হয় বিবিসি এবং সি এন এন এর মতো বিশ্বখ্যাত স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালা। তখন থেকেই আমাদের দেশের নির্মল আকাশে ছড়ানো হয় বিশ্বায়িত সংস্কৃতির গানপাওডার।

বাংলাদেশে স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার নিয়ে সর্বস্তরে একটি ভয় তখন কাজ করেছিল; যেমন বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন, আকাশ সংস্কৃতি গিলে খাবে নিজস্ব সংস্কৃতিকে। এই ভয়টা অমূলক ছিলো না মোটেই। কারণ বাংলাদেশে দুই তিনটা স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালু হওয়ার পরও কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি সমাজ-সংস্কৃতি- অর্থনীতিতে। বরং বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করেছিলো কারণ মেধাহীনতা, কাঠামোহীন স্থানীয় বাজার, অধিক পুঁজি নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধশীল পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতি। তবুও বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন প্রসার লাভ করতে থাকে এবং টেলিভিশন কেন্দ্রিক দুটি ক্ষেত্র বিকশিত হতে থাকে যেমন ১. ক্যাবল নেটওয়ার্ক ২. ব্যক্তিখাতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মার্নে পুজিঁ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।   এর ফলে প্রসারিত হতে থাকে ক্যাবল মার্কেট, যার ভোক্তা সারাদেশের সাধারণ দর্শক । আর ছোট করে হলেও স্থানীয় দুর্বল স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিখাতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মার্নে পুজিঁ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে মিডিয়া মার্কেট যা শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক। সেই মিডিয়া মার্কেটের ভোক্তা হচ্ছে স্থানীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো আবার স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলোর ভোক্তা হচ্ছে ক্যাবল নেটওর্য়াক।

অবশ্য বর্তমানে বাংলাদেশের বেসরকারী টেলিভিশনগুলো নিজেরাই অনুষ্ঠান নির্মার্নে পুজি লগ্নিকারক হিসাবে কাজ করছে। ১৯৬৪ সালের পর বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ২০০০ সালে একুশে টেলিভিশন যাত্রা শুরুর মাধ্যমে। একুশে শুধু টেরেস্ট্রিয়াল নয়, স্যাটেলাইট চ্যানেলেও ছিল। বাংলাদেশের একমাত্র একুশে টেলিভিশন (প্রথম পর্যায়) প্রমাণ করতে পেরেছিল দেশীয় মেধার শৌর্য, একটি যথার্থ টেলিভিশনের কাঠামোগত রূপরেখা এবং পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে খুবই স্বল্প সময়ে একুশে টেলিভিশন বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বাঙালির মেধা ও সৃজনশীল মননের বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছিল। তৈরি করেছিল অল্পদিনের মধ্যে সুবিবেচক দর্শক শ্রেণী তার বস্তুনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে। খুব অল্প সময়েই আর্বিভুত হয়ে উঠছিলো সমাজ প্রভাবক হিসাবে। শুধু সমাজেই নয়, বাজারকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিলো কিন্তু বর্তমানে বাজার প্রভাবিত করে স্যাটেলাইট টেলিভিশনকে । প্রথম পর্যায়ের একুশে টেলিভিশন পরমুখাপেক্ষিতা কাটিয়ে দর্শককে ভারতীয় চ্যানেল বিমুখ করতে পেরেছিল। ২০০২ সালের ২৯ আগস্ট একুশে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাংলাদেশে বিকশিত মিডিয়া মার্কেট স্যাটেলাইট চ্যানেল কেন্দ্রিক হতে বাধ্য হয় এবং উদার, একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধাণ্য স্খিমিত হয়ে একুশের তৈরী শক্তিশালী বাজারে গন্তব্যহীন, বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলন ঘটে । এসবের সাথে যুক্ত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আরো কিছু বাজারমুখী এবং পুঁজি কেন্দ্রিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। এসময়ে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক “মিডিয়া বাবল” ঘটে। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিচালনায় কুক্ষিগত মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি কত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে তার উদাহরণ

প্রথম পর্যায়ের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের একুশে টেলিভিশন। কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের একুশে খুবই ব্যার্থতার পরিচয় দেয় তার দূবর্ল, রুচিহীন ও মেধাহীন পরিচালনার কারণে । তবে এ কথা ঠিক যে, একুশে টেলিভিশনের মডেল সামনে না থাকলে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশনের চরিত্র আরো বিশৃঙ্খল, আরো এলোমেলো ও কাঠামোহীন হতো।

বাংলাদেশের নিজস্ব চ্যানেলের অনেক অমীমাংসিত বিষয়ের পাশাপাশি হিন্দীভাষী ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এক মূর্তমান র্দূভাবনার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। হিন্দীভাষী ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল শুধু ভারতের সামাজিক উদ্বিগ্নের কারণই নয় বাংলাদেশের দর্শককে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। শুধু দর্শকই নয়, গ্রাস করছে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোকেও। যেমন হুবহু দুর্বল অনুকরণ করে এখানে অনুষ্ঠান নিমার্ণ। শুধু স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের ব্যর্থতার কারণেই দর্শক ভারতীয় চ্যানেলমুখী হচ্ছে না বরং সরকার দশর্ককে সাহায্য করছে আরো অধিকতরভাবে ভারতীয় ও বিদেশী চ্যানেলমুখী হতে। কারণ বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (২০০১-২০০৬) কোন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা দেয়া হবে না বলে প্রস্তাব অনুমোদন (৩১ অক্টোবর ২০০৬) করে গেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলের অবকাঠামো খুবই দুর্বল। এটি চরম বাস্তবতা। বলা যায় এখন পর্যন্ত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামে স্যাটেলাইট সুবিধা নেই বললেই চলে। বেসরকারি খাতে টেরেস্ট্রিয়াল সুবিধা বন্ধ করে এবং শুধুমাত্র গণবিচ্ছিন্ন বিটিভির জন্য সংরক্ষণ করে মানুষ সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ফলে বাড়তি অর্থ ব্যয় করে স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। একটি প্রশ্ন হতে পারে যে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার আওতা সীমিত, তাহলে কেন তার উপর জোর দেয়া অথবা গুরত্ব দেয়া হবে কিংবা দেয়া উচিত? বর্তমানে স্যাটেলাইট টেলিভিশন এর সংবাদ পরিবেশনা খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকরী। বলা যায় বানিজ্যসফল নিরেপেক্ষ । তাই স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্পাদকীয় নীতিমালা হওয়া উচিত দেশের নীতিনির্ধারণী মহলের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসাবে ।

সুতরাং দর্শকের কাছে ততটা গুরত্বপূর্ন না হলেও কিংবা স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার আওতা খুবই সীমিত হলেও সমাজে তা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ।